শরীয়া আইন: ইসলামে রাজনীতি ও ধর্মের আন্তঃসম্পর্ক

বক্তৃতা: হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.), খলিফাতুল মসীহ রাবে'

ভাষান্তর: আবদুল্লাহ শামস বিন তারিক এবং সিকদার তাহের আহমদ

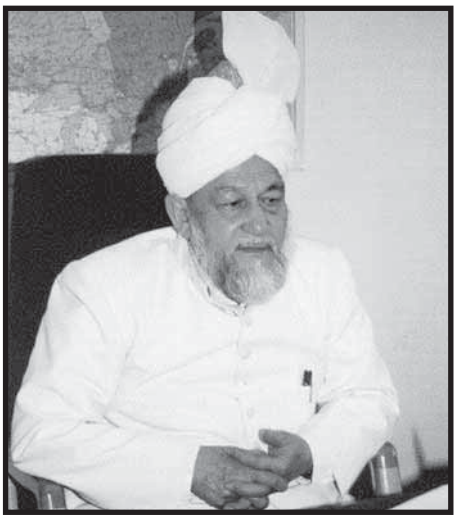

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.) ৩ জুন, ১৯৯১ সুরিনামে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সমিতি 'ইন্টার-রিলিজিয়াস কনসাল্টস'-এর সভায় প্রথম আমন্ত্রিত-বক্তা হিসেবে যে বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রশ্নোত্তর সভায় যে-সব জবাব দেন, তা পরবর্তীকালে ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্‌স, যুক্তরাজ্য কর্তৃক পুস্তিকাকারে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এখানে এর বঙ্গানুবাদ পেশ করা হলো।

অনুষ্ঠানের সভাপতির প্রারম্ভিক বক্তব্য

IRIS এবং এখানকার কমিউনিটির পক্ষ থেকে এই সভাতে আপনাকে [হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.)-কে] স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। IRIS-এর মানে 'Inter-Religiousraat In Suriname' অথবা 'Inter-Religious Consults in Suriname'।

এই সভায় আপনাদের স্বাগতম। এখানে আপনি এক সপ্তাহ ধরে রয়েছেন এবং ইতোমধ্যে অনুভব করেছেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে, আপনি এখানে সুরিনামে সাদরে আমন্ত্রিত। আতিথেয়তা ও হাস্যরসিকতার জন্য এই দেশটির সুখ্যাতি রয়েছে।

আপনার সম্পর্কে, আপনার পড়াশোনা ও বেড়ে উঠা সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে কিছুটা জেনেছি। তাছাড়া, সুরিনাম ও সারা পৃথিবীতে আপনার মিশন সম্পর্কেও আমরা কিছুটা জানি। আমরা যতটুকু বুঝেছি, আপনার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে একতাবদ্ধ করা, বিভিন্ন জাতি, দেশ এবং সংস্কৃতির মানুষকে একতাবদ্ধ করা। আর, আপনার বাণী হলো পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বাণী - শ্রদ্ধাপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে শান্তি ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত করার বাণী।

এই প্রেক্ষাপটে আজ সন্ধ্যায় আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সঙ্গে, IRIS কমিউনিটির সঙ্গে এই বিষয়ে আপনার চিন্তাধারা ও মতামত ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য।

IRIS হলো সুরিনামের ধর্মীয়-নেতৃবৃন্দের একটি দল, যা দুই/তিন বছর ধরে কাজ করছে। কিন্তু, এখন পর্যন্ত আমরা পারস্পরিক সংলাপ আদান-প্রদানের পরিবর্তে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। সুরিনামের জন-মানুষের মঙ্গলসাধনে আমরা একত্রে কাজ করছি। আর ইতোমধ্যে অনেকগুলো প্রকল্পের কাজও সম্পাদিত হয়েছে।

কিন্তু, এখন আমরা পারস্পরিক-সংলাপের কাজও করতে চাই। আমাদের চিন্তাভাবনা, ধর্ম নিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় করতে তাই আমরা অতিথি-বক্তাদের সাহায্য গ্রহণের পরিকল্পনা করেছি। এক্ষেত্রে, সুরিনামের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রেক্ষাপটে আয়োজিত প্রথম এই অনুষ্ঠানে আপনিই প্রথম বক্তা। আমাদের সঙ্গে যোগদান করায় আপনাকে ধন্যবাদ। আর আজকের সন্ধ্যার বক্তৃতার বিষয়, শরীয়া: ইসলামে রাজনীতি ও ধর্মের আন্তঃসম্পর্ক। আর এ আলোচনার পটভূমি এমন একটি দেশ, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সহযোগিতামূলক সহাবস্থানের পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

আজকের এজেন্ডার দ্বিতীয় বিষয় হলো 'আহমদীয়া' প্রশ্ন। আহমদী-মুসলমানদের নিপীড়নের পেছনের গভীর কারণসমূহ।

এখানে আসার জন্য আপনাকে আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাই। আমরা আশা করি, এই সন্ধ্যায় আপনার এবং আমাদের সকলের জন্য একটি আকর্ষণীয় সংলাপ, ভ্রাতৃত্বমূলক এবং ফলপ্রসু অভিজ্ঞতা হবে, যা সুরিনাম এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন-ধর্মের মাঝে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এবার আপনাকে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি ।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-র বক্তৃতা

মাননীয় বিশপ,
এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং সম্মানিত সকল অতিথি, ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ,

এই সমিতির ইতিহাসে 'প্রথম আমন্ত্রিত-বক্তা' হিসেবে আজ আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে আমার জন্য একটি বিশেষ

সম্মানের বিষয়।

এটি আমার জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তও বটে। উত্তেজনামুক্ত এবং আবেগমুক্ত পরিসরে কেবল স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে নিজের অভিমত তুলে ধরার, এবং আপনাদের সঙ্গে মুক্ত ও পরিপক্ক সংলাপের সুযোগ আমি পেয়েছি। এতে আপনাদের সামনে আমাদের অবস্থান তুলে ধরার এবং আপনাদের অবস্থান সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা নেয়ার সুযোগ পাচ্ছি। আসলে, মুক্ত-সংলাপের উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে। আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই। কারণ, আপনারা এই কল্যাণময় উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। আর, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ বিশ্বের সবারই এটি প্রয়োজন।

যে প্রশ্নের উপর আজ আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে তার বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ, এই সীমিত সময়ে খুব সম্ভবত বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতিও সুবিচার করা সম্ভব হবে না। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি, আমি যখন প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ শরীয়ত ও রাজনীতি, শরীয়া আইন এবং কোনো দেশে শরীয়া-আইনের প্রয়োগ–এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করবো, তখন যদি সময় থাকে তাহলে দ্বিতীয় বিষয়টি শুরু করবো। নতুবা, আমি সেখানেই শেষ করবো, যেন আপনারা আপনাদের অভিমত প্রকাশের সুযোগ পান এবং প্রয়োজনবোধ করলে আমার জন্য কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করতে পারেন।

আমি অবশ্য সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করবো, তবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনারও প্রয়োজন আছে। কেননা, শরীয়া আইন আজ এমন একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা নিয়ে মুসলিম বিশ্বে তুমুল বিতর্ক চলছে।

পাকিস্তানে শরীয়া আইনের প্রবর্তন

সম্প্রতি পাকিস্তানে শরীয়তের বিষয়টি উত্তপ্ত এবং কখনো কখনো সহিংস-বিতর্কের কেন্দ্রেও পরিণত হয়েছে। সাধারণভাবে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, যদি কোনো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান হয়ে থাকে, তবে সেই দেশে শরীয়া আইনের প্রচলন করাটা তাদের কেবল অধিকারই নয় - বরং দায়িত্বও বটে। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয় যে, পবিত্র কুর'আনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হল এ-কথা বিশ্বাস করা যে, পবিত্র কুর'আন এমন একটি পূর্ণাঙ্গ- কিতাব, যা মানবজীবনের সমস্ত আঙ্গিককে বেষ্টন করে আছে। আর, এক্ষেত্রে কেবল মৌখিক দাবি করাটা কপটতার নামান্তর। বরং সকলের দায়িত্ব, একে এর যৌক্তিক পরিণতিতে উপনীত করা এবং দেশে শরীয়া-আইন প্রতিষ্ঠা করা ও এটিকে দেশে বলবৎ 'একমাত্র-আইন' হিসেবে দাঁড় করানো।

এখন, এটা তো হলো এক পক্ষের কথা। অপরপক্ষে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যার দিকে ইশারা করা হয়। যেমন, আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত সমস্যা, যা অত্যন্ত গুরুতর সাংবিধানিক-জটিলতা এবং এসবের পাশাপাশি সর্বস্তরে শরীয়া- আইন বাস্তবায়নের গুরুতর প্রায়োগিক সমস্যার কথা বলা হয়ে থাকে। সুতরাং, প্রথমে আমাকে সংক্ষেপে বলতে দিন, কেন শরীয়া-আইন এমন কোনো জাতির উপর প্রয়োগ বা আরোপ করা যায় না, যারা বাস্তবে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে আদর্শ-মুসলমান নয়; বরং এর উল্টোটাই তাদের জন্য সাধারণতঃ সত্য। যেসব বিষয়ে ইসলামের অনুশাসন পালনে তারা পুরোপুরি স্বাধীন, সেসব বিষয়ে তারা এতোটাই পিছিয়ে থাকে যে, [তা দেখে] এ ভাবনার উদ্রেক হয়, যেখানে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম পালনে ব্যর্থ, সেখানে কীভাবে আশা করা যায় যে, বলপূর্বক বা আইনের জোরে তাদেরকে [সেসব পালনে] বাধ্য করা যাবে? এটি ছাড়াও অন্যান্য আরো বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে বিতর্ক বরং উত্তপ্ত-বিতর্ক চলছে। আমি এখন অতি সংক্ষেপে মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করবো, যেন আপনারা বিষয়টির উভয় দিক অনুধাবন করতে পারেন।

আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে, এ-বিতর্কে অংশ নিয়েছি, যা পাকিস্তানে চলছিল। এছাড়া, অনেক বিজ্ঞ-ব্যক্তি, যারা লন্ডনে এসেছেন কিংবা আমার কাছে পরামর্শের জন্য লিখেছেন, তাদেরকে আমি সাহায্য করেছি। তাদেরকে আমি যুক্তি-তর্ক লিখে দিয়েছি এবং বলেছি যে, - ব্যাপারটি এমন নয়; তবে, পুরো-সমস্যাটি একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে তারা আমার সাহায্য পেয়েছে। তাই বলা যায়, পাকিস্তানে এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলোর অনেকগুলোতেই আমার অভিমতও প্রকাশিত হয়েছে।

শরীয়তের বিধান-ই হচ্ছে 'ইসলামের আইন', এবং 'মুসলমানদের জন্য আইন' - এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, একে একটি রাজনৈতিক-সরকার পরিচালনার জন্য দেশের-আইনে রূপান্তর করা কতোটুকু সম্ভব? এরপর, আরো অনেকগুলো বিষয় এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। যেমন, যদি কোনো মুসলিম-রাষ্ট্রের এ অধিকার থাকে যে, এই আইন সেই দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর উপর আরোপ করবে, তবে একই ধারায়, একই যুক্তিতে, এমন সকল রাষ্ট্র, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ-জনসমষ্টি অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী, তাদেরও সেই একই অধিকার থাকবে যে, তারা চাইলে তাদের নিজ (ধর্মের) আইন বলবৎ করতে পারবে। তখন পুরো পৃথিবীই কেবল রাজনৈতিক বিরোধের ক্ষেত্র থাকবে না; বরং এমন এক ধর্মীয়-রাজনৈতিক-বিরোধেরও ক্ষেত্রে পরিণত হবে, যেখানে সকল আইনকেই খোদাতা'আলার প্রতি আরোপ করা হবে, অথচ সেগুলো হবে একে অপরের সম্পূর্ণ-বিপরীত। এতে এমন এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে যে, মানুষ খোদার উপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করবে। কারণ, খোদা এক জাতির কাছে এক ধরনের শিক্ষা অবতীর্ণ করেন; আবার সেই খোদা অন্য জাতির কাছে ভিন্ন শিক্ষা অবতীর্ণ করেন। আর, তাদেরকে এই (পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ) আইনগুলো (নিজ নিজ) জাতির উপর আরোপ করতে বলেন। এটাও বলেন যে, এরূপ না করলে তারা খোদার সমীপে বিশ্বাস ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, ভারতে যদি হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠের আইন সংখ্যালঘু-মুসলমানদের উপর আরোপ করা হয়, তাহ'লে কী হবে, তা আপনারা ভালই কল্পনা করতে পারবেন। আমি যা অনুমান করতে পারি, এতে কিছু কিছু মুসলমান-দেশে যা হচ্ছে, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, ভারতীয়-সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে বস্তুতঃ ক্রমাগতভাবে এই চরমপন্থী-দাবির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় ভারতের মুসলমানদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু-শ্রেণীর পরিণাম কী হবে? উপরন্তু, এ প্রশ্ন কেবল ভারতের প্রশ্ন নয়। যদি ইসরাঈল ইহুদী-ধর্মের আইন বলবৎ করে - অর্থাৎ তালমুদের আইন - (আমি তা পাঠ করেছি) আমি বলতে পারি যে, সেখানে কোনো অ-ইহুদীর পক্ষে, অন্ততঃ স্বাভাবিক ও সম্মানজনকভাবে বসবাস করা অসম্ভব হবে।

অনুরূপভাবে, খ্রিস্ট-ধর্মেরও (নিজ ধর্মভিত্তিক আইন প্রণয়ন করার) অধিকার থাকবে। একইভাবে বৌদ্ধ-ধর্মের জন্যও একথা প্রযোজ্য।

আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ

এর পরের বিষয়টি রাষ্ট্রের ধারণার মৌলিক-বিষয়গুলোর একটি: যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদের জন্য এ-বিষয়ের আলোচনা ও সুরাহা প্রয়োজন। প্রশ্নটি এই যে, একটি রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী যে-কোনো ব্যক্তি সেই দেশের আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণের অধিকার রাখে।

সরকার পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ-ধারণার কোনো দেশে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে মৌলিক নাগরিক-অধিকার লাভ করে। আর এসব অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে বাস্তব রূপ প্রদানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভের বিষয়টি।

দল অবশ্যই আসে আর যায়। আজ যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী, তারা কাল সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে পারে। সকলের আশা পূরণ হয় না, বাস্তবায়িত হয় না। কিন্তু, নীতিগতভাবে প্রত্যেকে নিজ-মতামত অন্য দলের সামনে প্রকাশ করার ন্যায্য ও সমান অধিকার রাখে। কিন্তু, যদি কোনো একটি শরীয়ত বা ধর্ম কোনো দেশের-আইন হিসেবে নির্ধারিত হয়, তখন কী হবে? যদি কোনো দেশে মুসলিম-আইন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেই ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী [মুসলমান ছাড়া] আর সবাই দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। দেশে আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। কিন্তু, এখানেই সমস্যার শেষ নয়। ইসলামের মধ্যে আরো জটিলতা এই যে, ইসলামে একটি ঐশী-কিতাব রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ এবং মুসলমান-আলেমরা এই দাবি রাখে যে, এই কিতাবের ব্যাখ্যার একচ্ছত্র অধিকার কেবল তারাই রাখে।

আইনসভা ধর্মীয় উলামার অধীন

যেখানে মতভেদের উদ্ভব হবে, সেখানে আইনসভা ঐ সকল আলেমের জ্ঞানগত-অভিমতের অধীন হবে, যারা পবিত্র কুর'আনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ; কিংবা যারা পবিত্র-কুর'আনের ব্যাখ্যার বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবি করে থাকেন। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে? একটি সংসদ আইন-প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত। তারা একটি আইন প্রণয়ন করবে, আর ইসলামের কতিপয় উলামা বলে উঠবে, "যা প্রস্তাব করা হয়েছে, তা ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী, ইসলামে এসব অর্থহীন-বিষয়ের কোনো স্থান নেই।"

এক্ষেত্রে কার মতামত গৃহীত হবে? একদিকে, আপাতদৃষ্টিতে এ-লোকগুলোর কথার সমর্থনে 'খোদা তা'আলার কথা' বলা হচ্ছে, যদিও কেবলই তা আপাতদৃষ্টিতে। অপরদিকে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কণ্ঠ! সুতরাং, দ্বন্দ্বটি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, এর সুরাহা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল ধর্মের বহুধাবিভক্ত রূপ

কিন্তু, এখানেও শেষ নয়। শুরুতে সাধারণতঃ প্রতিটি ধর্মই এক এবং অবিভাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু, কালের পরিক্রমায় সেগুলোর মধ্যে বিভেদ ও বিভক্তির উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়। ফলে সেই একই ধর্ম, যেমন ঈসা (আ.)-এর যুগের একমাত্র খ্রিস্টধর্ম সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত শত শাখা-উপ-শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন ফির্কার/উপদলের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসমূলের সেই একই ধর্ম তখন ভিন্ন ভিন্ন রঙ পরিগ্রহ করে। একেক ফির্কার অনুসারীরা একেক রঙের চশমা পরে একই উৎসের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে) থাকেন। ইসলামের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এটা কেবল সুন্নী- ইসলাম আর শিয়া- ইসলামের এবং তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তের ব্যাখ্যার বিষয় নয়।

শিয়া-ইসলামের মধ্যেই ৩৪টি ফির্কা রয়েছে, যাদের শরীয়তের ব্যাখ্যার মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ রয়েছে। আবার, সুন্নী ইসলামের মধ্যে আরো অন্তত ৩৪টি ফির্কা রয়েছে, যাদের শরীয়তের ব্যাখ্যা একে অপরের পরিপন্থী। এমন অনেক বিষয় আছে, যেখানে কোনো দুই ফির্কা ও দুই উলামা, একমত নন। কেবল ছোটখাট বিষয় নয়; এমন অনেক মৌলিক বিষয়ও রয়েছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে তারা ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। কেবল 'মুনির তদন্ত কমিশন রিপোর্ট'-টি একবার পড়ে দেখুন, আপনারা বুঝে যাবেন। বিচারপতি মুনির ছিলেন পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি। তিনি সেই দু'জন বিচারপতিদের অন্যতম যারা ১৯৫৩ সালের আহমদীয়া-বিরোধী দাঙ্গার পটভূমি, পেছনের-কারণসমূহ এবং কর্মকৌশল তদন্তের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দাঙ্গার জন্য কে বা কারা দায়ী, কারা দায়ী নয়, মুসলমানের সংজ্ঞা কী - এসব বিষয়ও তারা খতিয়ে দেখেছিলেন।

তদন্ত চলাকালে বহু মুসলিম উলামাকে বিচারপতি মুনিরের সামনে উপস্থিত করা হয়। তাদের কাছে তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানতে চান, মুসলমানের সংজ্ঞা কী? আর তাদের দেওয়া এই সংজ্ঞা কি অন্যান্য ফির্কার কাছেও গ্রহণযোগ্য? এই সংজ্ঞা কি সবার উপর সমভাবে প্রয়োগ করা যাবে? এর দ্বারা কি আমরা বলতে পারবো যে, হ্যাঁ, 'এই হলো মুসলমান' এবং 'ঐ হলো অমুসলিম'? তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বিচারপতি মুনির বলেন, তদন্তকালে যতগুলো মুসলিম আলেমের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো দুইজন উলামাই মুসলমানের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একমত হতে পারেন নি।

এই তদন্ত কমিটিতে বিচারপতি মুনিরের সহযোগী ছিলেন বিচারপতি কায়ানী। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রসবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি। তদন্তকালে বিশেষ কোনো একজন আলেম যখন বলেন, তিনি বিষয়টি আরেকটু ভেবে দেখতে চান। তখন জবাবে বিচারপতি কায়ানী বলেন, আমি আপনাকে আর সময় দিতে পারি না। **কেননা, আপনারা [আলেমগণ] ইতোমধ্যেই এ নিয়ে চিন্তা করার জন্য তেরশ বছরের বেশি সময় পেয়েছেন। এই সময় কি যথেষ্ট নয়?**

যদি তের শতাব্দী এবং আরো কয়েক বছরেও আপনারা ইসলামের সংজ্ঞার মতো একটি মৌলিক বিষয়ে আপনাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পারেন, তাহলে এখন আর কি-ই বা সংজ্ঞা দিবেন? আর কতো সময়ই বা লাগাবেন?

সুতরাং এটি অত্যন্ত গুরুতর একটি বিষয়। যদি শরীয়ত সম্পর্কে কোনো একটি ফির্কার ব্যাখ্যা বলবৎ করা হয়, তাহ'লে কেবল যে অমুসলিমগণই রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়নে ভূমিকা রাখার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, তা-ই নয়; বরং ইসলামের মধ্যেও এমন অনেক ফির্কা থাকবে, যারা [অমুসলিমদের মতো একইভাবে] এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

শরীয়া আইন হিসেবে কোন্ ফির্কার ব্যাখ্যা বলবৎ করা হবে?

এখানে আরো অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো অপরাধের শাস্তির বিষয়ে শরীয়তের- শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন ফির্কার ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য এতোটাই প্রকট যে, দেখা যাবে, একই বিষয়ে বিভিন্ন দেশে অনুসৃত ইসলামের রূপ এতোটাই ভিন্ন ভিন্ন হবে যে, অমুসলিম-বিশ্বে এটা ইসলামের একটি বীভৎস চিত্র তুলে ধরবে। প্রশ্ন উঠবে, এটা কেমন ধর্ম যে, একই অপরাধের জন্য এক স্থানে এক শাস্তি আর আরেক-স্থানে আরেক শাস্তির কথা বলে? আর অন্য কোনো স্থানে সেই একই কাজ আবার পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য বলে গৃহীত হয় এবং অপরাধ হিসেবেই গণ্য হয় না?

এ বিষয়টি এবং আরো অনেকগুলো বিষয় শরীয়া-আইন প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে।

তদুপরি, আরো অনেক সম্ভাব্য-ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে অন্যান্য ফির্কার মৌলিক-অধিকার খর্ব হয় বা লঙ্ঘিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মদ্যপানের প্রশ্নে বলা যায়: এটা তো সত্য যে, ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ; কিন্তু, এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ কি-না, এবং কোনো শাস্তি নির্ধারিত থাকলে তা এ-পৃথিবীতে মানুষেরা কার্যকর করবে কি-না, এটি একটি খোলা প্রশ্ন। এটি একটি বিতর্কিত-বিষয় এবং এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে এখনো একমত নন। মদ্যপানের শাস্তি কী? পবিত্র কুর'আনে কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয় নি। এটি একটি মৌলিক বিধান - কিন্তু এখানে একদিকে আমাদের বিধানের কিতাব (পবিত্র কুর'আন), অপরপক্ষে কেবল কিছু হাদীসের বরাতে কোনো কোনো আলেম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অমুক শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু, এ-সিদ্ধান্ত সুদূর পরাহত আর খোদ হাদীসগুলোর সত্যতার উপর অন্যান্যরা জোরালো আপত্তি উত্থাপন করেছে।

সুতরাং, এভাবে দেখা যাবে যে, কেবল মুসলিম-সমাজের এক বড় অংশই নয়, বরং অমুসলিম-সমাজেরও এক বড় অংশ এমন বিষয়ের জন্য শাস্তি পাবে, যার শাস্তিযোগ্যতার বিষয়টিই প্রশ্নবিদ্ধ। শাস্তি প্রদান যথার্থ কি-না, সেটিই বিতর্কের বিষয়। কিন্তু, এরপরও সর্বত্র চরমপন্থীরা রয়েছে, বিশেষ করে যারা শরীয়া-আইন প্রতিষ্ঠায় তৎপর।

আপনারা এমন অনেক চরমপন্থীকে পাবেন, যাদের অন্যের অভিমতের বিষয়ে সামান্যতম সহিষ্ণুতাও নেই। ফলস্বরূপ, এরূপ চরমপন্থীরা এ-ধরনের সন্দেহযুক্ত বিষয়কেও সন্দেহাতীত বলে গণ্য করবে। তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমরা জানি; এটা আমাদের অভিমত। এ-অভিমত অমুক মধ্যযুগীয় আলেম কর্তৃক সমর্থিত কিংবা আমাদের নিজেদের চিন্তাপ্রসূত। আর এটাই এখন আইন'।

শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান-সরকারের অসুবিধাসমূহ

এই মতপার্থক্য থেকেই সম্প্রতি পাকিস্তানে এক আলোচনা হয়েছে, এবং শেষ-পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন যে, কোনো একটি ফির্কার শরীয়া গ্রহণ করা হবে না।

পাকিস্তানে যে-আইন পাশ করা হয়েছে, তা এই যে, কুর'আনের শ্রেষ্ঠত্ব শিরোধার্য হবে, আর এমন কোনো আইন পাশ করা হবে না, যা কুর'আনের শিক্ষার পরিপন্থী হবে। কিন্তু, এর বাইরে এমন কোনো নিয়ম-কানুন প্রচলন করা হবে না, যার ভিত্তি এরূপ হবে যে, যেন এগুলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ আইন।

সুতরাং, এখন শরীয়া আইনের যা বাকি থাকলো, তা পবিত্র কুর'আনের সাধারণ নীতিসমূহ, যার আলোকে দেশের প্রচলিত-আইনগুলোকে ইসলামীকরণের চেষ্টা করা হবে।

যাহোক, আমার মনে হয়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী একটি অত্যন্ত কঠিন অবস্থা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু তা-বেশি দিনের জন্য নয়। আলেমরা ইতোমধ্যেই তার উপর চড়াও হয়ে আছে। তাদের দাবি হলো যে, শরীয়া-আদালত কেবল জারি রাখলেই চলবে না- (ইতোমধ্যেই একটি শরীয়া আদালত সেখানে বিদ্যমান)- বরং কার্যকারিতার জন্য এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। আর কোনো আইন ইসলামসম্মত কি-না, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার চূড়ান্ত এক্তিয়ার শরীয়া-সুপ্রিম-কোর্টের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত।

এভাবে, ক্ষমতার কেন্দ্র দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাত থেকে আবারো চরমপন্থী-মোল্লাদের হাতে চলে যাবে। সুতরাং, একবার কোনো কিছু- যার বাস্তবায়ন অসম্ভব- মেনে নিলে তা সবসময় নানা সমস্যার দিকে ধাবিত করে এবং পরবর্তীতে বাড়তি-জটিলতার উদ্ভব হয়।

আজকের মুসলমানদের জীবনধারা সত্যিকার ইসলামসম্মত নয়

এতো গেল সমস্যার একটি ক্ষেত্র। কিন্তু, সমস্যার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে: তা হলো, অধিকাংশ দেশের মুসলমানদের জীবনধারা সত্যিকার-অর্থে গভীরভাবে ইসলামী নয়।

চিন্তা করে দেখুন, দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ার জন্য শরীয়া আইনের প্রয়োজন নেই। নিজে সৎভাবে জীবনযাপন করার জন্যও কোনো শরীয়া আইনের দরকার হয় না। সত্য কথা বলার জন্য, আদালতে বা অন্য কোথাও সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে শরীয়া আইনের কোনো প্রয়োজন নেই। একটি সমাজ, যেখানে ডাকাতি করা নিত্যনৈমত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিরাজ করে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, অন্যের অধিকার হরণ, যেখানে সত্যবাদী-সাক্ষ্যদাতার সন্ধান কদাচিৎ মিলে, যেখানে নিত্যদিনের কথোপকথন নোংরা-ভাষায় পরিপূর্ণ, যেখানে মানব-আচরণে শালীনতার কোনো অংশই আর বাকি নেই, সেখানে শরীয়া-আইনের কী ফলাফল আপনারা আশা করতে পারেন? এরকম একটি দেশে প্রকৃতপক্ষে কীভাবে শরীয়া আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব? এটাই প্রশ্ন।

শরীয়া আইন প্রচলনে উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন

উত্থাপিত প্রশ্নটিকে আমি ভিন্নরূপে উপস্থাপন করছি, আর এটা আগেও আমি উত্থাপন করেছি, আর আজ পর্যন্ত এমন কোনো উত্তর শুনি নি, যা বিষয়টির সমাধান করতে পারে।

কথা হলো, প্রত্যেক দেশেরই একটি নির্দিষ্ট জলবায়ু হয়ে থাকে, আর সব ফুলই সেই জলবায়ুতে ফোটে না। মরুভূমিতে খেজুর হয়, কিন্তু, শীতপ্রধান উত্তরাঞ্চলে হয় না। অনুরূপভাবে মরুভূমিতে চেরি ফলের চাষ সম্ভব নয়; এর জন্যও বিশেষ ধরনের জলবায়ু প্রয়োজন। শরীয়া-আইনের জন্যও এক বিশেষ-পরিমণ্ডল প্রয়োজন। যদি আপনি সেই পরিমণ্ডল সৃষ্টি না করে থাকেন, তবে শরীয়া-আইন আরোপ করা যায় না।

কেবল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) নয়, সকল নবীই প্রথমে সেই সুস্থ-পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন; যেন তাতে ঐশী- আইন প্রচলন করা যায়, বলপূর্বক নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আর যখন সমাজ তৈরি হয়েছে, এই আইনগুলো একে একে বলবৎ করা হয়েছে এবং পুরো আইন অবতীর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত ধাপে ধাপে কার্যকর করা হয়েছে । সেই সমাজ, ধর্মীয়-আইনের - একে আপনি শরীয়া আইন বলুন বা অন্য কোনো আইন বলুন- সেই ভার বহনের যোগ্য ছিল তারা।

একটি সমাজ, যেখানে চুরি সাধারণ বিষয়, যেখানে মিথ্যা বলাটা মানুষের প্রতিদিনের অভ্যাস, সেখানে যদি আপনি শরীয়া-আইন বলবৎ করেন, আর যারা চুরি করে, তাদের হাত কেটে দেন, তবে কী হবে? এটাই কি শরীয়া- আইনের উদ্দেশ্য? এটা কেবল ধর্মীয়-অনুভূতির বিষয় নয়। খোদাতা'আলার আইন অবশ্যই প্রচলিত হবে, তবে তা সেই সুশৃঙ্খল-পদ্ধতিতে হবে, যা খোদাতা'আলা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন।

ক্ষমতা দখলের বাহানা হচ্ছে শরীয়া আইন

আমি কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতাকে এ পরামর্শ দিয়েছি যে, তাদের উচিত, প্রথমে সকল আলেমকে আহ্বান করা; যেন তারা পাকিস্তানের একটি ছোট নগরীর সংস্কারসাধন

করেন এবং তারপর সেখানে শরীয়া আইন আরোপ করেন। উদাহরণস্বরূপ, ফয়সালাবাদ একটি ছোট নগরী বা একটি বড় শহরও বলা যায়- মূলত: যা ব্যবসায়ীদের শহর, যারা নানা দুর্নীতি ও অসদাচরণের জন্য সুপরিচিত।

আমার প্রস্তাব হল, পুরো পাকিস্তানের আলেমদের প্রথমে আহ্বান করা হোক, যেন তারা প্রথমে ঐ একটি শহরের সমাজের সংস্কার সাধন করে। আর যখন সেই শহরের বাসিন্দারা শরীয়তের ভার বহনের যোগ্য হয়ে উঠবে, তখন সরকারকে আহ্বান করা হোক, যেন তারা এসে শরীয়া-আইনের মাধ্যমে প্রশাসনের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু এরূপ হবে না। তাদের এ বিষয়ে কোনো পরোয়া নেই। তারা এ নিয়ে উদ্বিগ্নও নয়। এটি ইসলামের প্রতি তাদের ভালোবাসা নয়, যা তাদেরকে শরীয়া-আইনের দাবি করতে উদ্বুদ্ধ করছে। এটি কেবল শাসন-ক্ষমতার নাগাল পাওয়ার একটি মাধ্যম, যা-দ্বারা শাসন-ক্ষমতা দখল করে, খোদার দোহাই দিয়ে, তারা সমাজের-উপর শাসন চালাবে। সমাজ তো বর্তমানে দুর্নীতিগ্রস্ত, নিষ্ঠুর লোকদের দ্বারা শাসিত। কিন্তু, এসবই হচ্ছে মানুষের নামে; যা কিছুটা হলেও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু, যখন খোদাতা'আলার নামে বর্বরতা পরিচালিত হয়, তখন মানুষের জন্য এর চেয়ে মন্দ, এর চেয়ে কুৎসিত আর কিছু হতে পারে না।

সুতরাং, পৃথিবীতে কোথাও ধর্মীয়-আইনকে রাষ্ট্রীয়-আইন হিসেবে প্রয়োগের কথা বিবেচনা করার আগেই আমাদেরকে বহু, বহুবার চিন্তা করতে হবে যে, ধর্মীয়-আইনকে রাষ্ট্রীয়-আইন হিসেবে প্রয়োগ করা যায় কি-না। ব্যক্তিগতভাবে (এটি আদৌ সম্ভব কি-না এ বিষয়ে) আমার দ্বিধা-দ্বন্দ রয়েছে।

এখানেই আমি আলোচনার সাময়িক ইতি টানছি। যদি আপনারা মনে করেন দ্বিতীয় প্রশ্নটির টীকায় আলোচনার সময় আছে, তবে আমি আলোচনা করবো। নতুবা, আমরা বসে এর উপরই আলোচনা করতে পারি, যা আমি এ পর্যন্ত বলেছি।

এই বক্তৃতার পরে বক্তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যেমনটি পাঠক নিজেও অনুধাবন করবেন, কোনো কোনো প্রশ্ন সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি, তবে উত্তর হতে অনুমান করা যায়, প্রশ্নটি কী-ছিল।

প্রশ্ন: পশ্চিমা-জগতে শরীয়া সম্পর্কে কি বিশেষ কোনো ভুল বুঝাবুঝি আছে?

উত্তর: [হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)]: আপনার স্পষ্ট প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু, আমি ভেবেছিলাম এ বিষয়টি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে।

আমরা যা আলোচনা করছি তা হল, যে-কোনো রাষ্ট্র বা যে-কোনো ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয়-আইনকে রাষ্ট্রের আইন হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব কি-না!

আমার বিশ্বাস যে, এটা সম্ভব নয়। এটি সম্ভব নয়, যদিওবা আপনি অত্যন্ত আন্তরিক ও আকুলভাবে এরূপ আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তবুও এটা সম্ভবই নয়। আমরা ধর্ম থেকে এতটাই দূরে সরে গিয়েছি যে, আমরা মুনাফিক (কপট - মুখে এক, কাজে আরেক) হয়ে গিয়েছি। রাজনীতিতে কপটতা, আর সমাজের সর্বত্র কপটতা। আর এ কপটতা সততার প্রসারের সুযোগ দেয় না, খোদার কালামকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। এটিই মূল সমস্যা।

প্রশ্ন: আমার অনুভূতি এই যে, এমন এক আইন, যা পুরনো কোনো যুগের জন্য এসেছিল, তা প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রয়োগ করতে পারি না। অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর: আমি এ-প্রশ্নটির উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছি। আমার বিশ্বাস: ধর্ম চিরন্তন ও সর্বজনীন হতে পারে; তবে শর্ত এই যে, এর মূলনীতি মানব-প্রকৃতির গভীরে গাঁথা হতে হবে। মানবপ্রকৃতি অপরিবর্তনীয়। আর হুবহু এটাই হচ্ছে পবিত্র কুর'আনের দাবি। এটি বলে যে, এ হল **'দীনুল ফিতরৎ'** অর্থাৎ এমন এক ধর্ম বা বিধান, যার ভিত্তি মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত। এবং আরো বলে যে, **'লা তাবদীলা লিখাল্‌কিল্লাহ'** অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই।

ফলে এমন যে-কোনো আইন বা জীবন-বিধান, যা মানব-প্রকৃতিমূলে প্রতিষ্ঠিত, অবশ্যই তাকে সর্বজনীন ও স্থায়ী হতে হবে। কিন্তু, পবিত্র কুর'আন সেখানেই থেমে যায় না। সত্যের উপর একচ্ছত্র অধিকারের দাবিও করে না । বরং, এটি বলে যে, সকল ধর্মই, তাদের জন্মলগ্নে এবং প্রাথমিক উন্নতির পর্যায়ে মূলত একই ছিল এবং তারা সকলেই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত-মৌলিক সত্যগুলো ধারণ করতো। আল্ কুর'আনে একেই **'দীনুল কাইয়্যিমা'** বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সকল ধর্মীয়-শিক্ষায় তিনটি মৌলিক বিষয় রয়েছে:

প্রথমত: নিজ-খোদার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ও নিবেদিত থাকা।

দ্বিতীয়ত, তাঁর (খোদার) ইবাদত করা।

কুর'আনের ভাষ্যমতে ইবাদতের অর্থ কেবল মুখে তাঁর প্রতি স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করে ভক্তি প্রকাশ করা নয়; বরং খোদার রঙে রঙিন হওয়া, অর্থাৎ তাঁর গুণাবলী নিজের মাঝে ধারণের চেষ্টা করা।

তৃতীয়ত, মানবতার সেবা করা এবং আর্তের জন্য ব্যয় করা।

এগুলো হল সেই তিন মৌলিক শাখা, পবিত্র কুর'আন অনুসারে যেগুলো সকল-ধর্মের সাধারণ-বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, সময়ের পরিক্রমায় এবং হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে এর রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং, যা প্রয়োজন, তা হল-এ বিকৃতির সংস্কার করা। নতুন ধর্ম নয়। আর প্রত্যেক নবীর [আ.] আগমনে ঠিক এটাই সংঘটিত হয়েছে।

সুতরাং, এটি একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন, আর আজকের আলোচ্য বিষয়েরর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্তও নয়। তাই আমি মনে করি, আপাতত এটুকুই যথেষ্ট।

যতদূর পর্যন্ত এ-প্রশ্নের বিষয় যে, ইসলামী আইন, বা অন্য কোনো ধর্মীয় আইন, বলপূর্বক আরোপ করা যায় কি না- আমি বলি, না। কেননা, এটি ধর্মসমূহের মূল-চেতনার পরিপন্থী। পবিত্র কুর'আন বলে:

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

(লা ইকরাহা ফিদ্দীন)

অর্থ: 'ধর্মের বিষয়ে কোনো বল প্রয়োগ নেই'। (সূরা বাকারা : ২৫৭)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: অতএব তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যাহার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম–কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা অবগত নহে।
(সূরা আর্ রূম : ৩১)

এটি কুর'আনের বাক্য বটে; তবে এটি একটি সর্বজনীন বিবৃতিও বটে; যার পরিবর্তন কখনো সম্ভব নয়। এটি এ- বিষয়ের উদাহরণ যে, কীভাবে বিধানসমূহ স্থায়ী ও সর্বজনীন হতে পারে। এটি বলে যে, ধর্ম বা ধর্মীয় বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই। কোনো জবরদস্তি সম্ভবও নয়, আর কোনো জবরদস্তির অনুমতিও নেই। সুতরাং, এখানে এ প্রশ্ন উঠে: যদি এক ধর্ম তার আইনকে

এমন এক সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়, যেখানে অন্যান্য ধর্ম ও মতাবলম্বী মানুষও বাস করেন, তখন এ-আয়াত কীভাবে এরূপ চাপিয়ে দেওয়ার বিপক্ষে দাঁড়াবে? কেবল ভিন্ন- ধর্মাবলম্বীদের বেলায় নয়; বরং একই ধর্মের ঐসব লোকের বেলায়ই বা কী হবে, যারা স্বেচ্ছায় ধর্মীয় অনুশাসন মানতে ইচ্ছুক নন?

সুতরাং এটিই হল মৌলিক প্রশ্ন। অতএব, উপসংহার এই যে, ধর্মে বল প্রয়োগের কোনো স্থান নেই, ধর্মে এটি বৈধ কোনো প্রক্রিয়া নয়।

ইসলামে একমাত্র কর্তৃপক্ষ, যাকে প্রকৃতপক্ষেই বলপ্রয়োগের অধিকার দেওয়া যেতে পারতো, তিনি হলেন ইসলামের মহান প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। কেন? কারণ, তিনি ছিলেন ইসলামের জীবন্ত-মডেল বা নমুনা এবং যখন তাঁর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তাঁর পবিত্র সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'তিনি হলেন জীবন্ত-কুর'আন'।

সুতরাং, সেই একমাত্র ব্যক্তি, যার উপর প্রকৃতপক্ষেই অন্যের বিশ্বাসের ভার ন্যস্ত করা যেত, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বল-প্রয়োগের অনুমতিও দেওয়া যেত, যদি তিনি সংশোধনের জন্য বল-প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করতেন, তিনি হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

তথাপি, তাঁকে উদ্দেশ্য করে, কুর'আনে আল্লাহতা'আলা বলেন (সূরা আল্ গাশিয়া : ২২-২৩)

إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝

(ইন্নামা আন্তা মুযাক্কির। লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির)

তুমি কেবল একজন সতর্ককারী, এর বেশি কিছু না। তোমাকে বল-প্রয়োগের কোনো অধিকার দেওয়া হয় নি। তুমি দারোগা নও। মুসাইতির বলতে পুলিশের দারোগাকেই বুঝিয়ে থাকে।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

অর্থ: ধর্মের ব্যাপারে কোন বলপ্রয়োগ নাই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মযবুত করিয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ভাঙ্গিবার নহে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (সূরা আল বাকারা : ২৫৭)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝

অর্থ: সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি কেবল একজন উপদেশদাতা মাত্র।

তুমি তাহাদের জন্য জিম্মাদার নহ।
(সূরা আল্ গাশিয়া : ২২-২৩)

অতএব, এ কারণেই আমি বলি, বল প্রয়োগ করে ধর্ম পালন করানো সম্ভবও নয়, আর এর অনুমতিও নেই। সর্বোপরি, একজন মুসলমানের জন্য ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণে বাধা কোথায়? পুরো দেশের আইনের সংশোধনের জন্য কেউ অপেক্ষা করবে কেন?

ইসলামের অধিকাংশ বিধি-বিধান, আর খ্রীষ্ট-ধর্মের অধিকাংশ বিধি-বিধান আর হিন্দু ধর্মের অধিকাংশ বিধি-বিধান এমন যে, সেগুলো দেশের আইন হিসেবে প্রচলন ছাড়াও পালন করা সম্ভব। আর আজ এ-কথা আরো বেশি সত্য; কেননা, আধুনিক রাজনৈতিক-দার্শনিকদের মাঝে সাধারণভাবে গৃহীত নীতি হল– রাজনীতিতে ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, আর ধর্মেও রাজনীতির হস্তক্ষেপের কোনো অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

এখানে আমি যে-বিষয়টির কথা বলছি, তা হল হস্তক্ষেপের, সহযোগিতার নয়। সহযোগিতা এ-বিষয়েরই দ্বিতীয় অংশ। সুতরাং, যদি একটি সমাজ তার নিজ ধর্মীয়-প্রেরণা অনুসারে জীবনযাপনের সুযোগ পায়, তবে সেই ধর্মের আইনকে দেশের আইনে কেন পরিণত করা হবে?

আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি যে, কীভাবে পাকিস্তানে শরীয়া-আইন ইতোমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। প্রয়াত জেনারেল জিয়ার শাসনামলে মুসলিম শরীয়া আদালতও গঠন করা হয়। পুলিশের হাতে-এ বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হয় যে, তারা কোনো অভিযুক্তকে মুসলিম শরীয়া-আদালতে প্রেরণ করবে, নাকি সাধারণ আদালতে প্রেরণ করবে। আপনারা জানেন কি-এর ফলে কী হল?

বলতে গেলে শরীয়া আদালতে কোনো মামলারই বিচার হল না, কেননা পুলিশ কেবল ঘুষের অঙ্ক বাড়িয়ে দিল আর সকলকে ভয় দেখাতে লাগলো যে, যদি তারা নিয়মিত দেয়া ঘুষের অংকের দ্বিগুণ ঘুষ না দেয়, তবে তাদের মামলা শরীয়া-আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মোটের উপর এই ছিল ফলাফল। আর আপনারা আশ্চর্য হবেন যে, হাজার হাজার সম্ভাব্য ক্ষেত্রের মধ্যে কেবল দুই বা তিনটি এমন মামলা ছিল, যেগুলোর বিচার শরীয়া আদালতে হয়েছিল আর তাও কেবল রাজনৈতিক চাপের কারণে। কেননা, কোনো কোনো রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চাচ্ছিল, আর তাদের অভিপ্রায় ছিল যে, এমন মামলাগুলো যেন শরীয়া আদালতে উত্থাপিত হয়।

সুতরাং, এই হল জীবনের বাস্তবতা। আমরা কীভাবে একে পরিবর্তন করতে পারি?

প্রশ্ন: তাহলে নতুন নবীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শরীয়তের বিধানে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: প্রথমত আমি বলতে চাই যে, এভাবে বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। কেননা, যখন আপনি ধর্মের ইতিহাস চর্চা করবেন, তখন দেখবেন যে, এমন নয় যে, প্রত্যেক নবীই পূর্বের নবীর উপরে অবতীর্ণ বিধানের পরিবর্তন করার জন্য এসেছিলেন। বরং, অধিকাংশ সময় নবীগণ পূর্বের নবীর বিধানকে পরিবর্তনের বদলে সেটিকেই শক্তিশালী ও পুনর্বাসিত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনারা ইহুদি-ধর্মের ইতিহাস দেখেন, আপনারা আশ্চর্য হবেন যে, এমনকি যীশু খ্রিস্ট (আ.) পর্যন্ত কোনো নতুন-আইনের প্রচলন বা সূচনা করা হয় নি।

মানুষ এগুলোকে বিকৃত বা পরিত্যাগ করেছে, আর নবীগণ একেই পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করেছেন, যেন লোকেরা পুনরায় তদনুসারে জীবনযাপন করে। এছাড়া নবীগণ মূল-বিধানের আলোয় পুনরায় এর ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন।

সুতরাং, ধর্মের যে-ইতিহাস বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর উপর দৃষ্টিপাতে আমাদের সামনে আসে, তা সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, চীনের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। তাও (ঞধড়) একটি শিক্ষা নিয়ে

এসেছিলেন। কনফুসিয়াস সেই শিক্ষার একটি কানা-কড়িও পরিবর্তন করেন নি। হুবহু সেই শিক্ষাই তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন।

তবে, আমি একমত যে, পবিত্র কুর'আনও স্পষ্টভাবে বলে যে, কোনো কোনো সময়ে ধর্মীয় বিধানেরও পরিবর্তন হয়। কিন্তু, প্রশ্ন হল, এ-পরিবর্তন কি মৌলিক বিষয়ে হয়, নাকি বাহ্যিক-বিষয়ে (ংঁঢ়বৎভরপরধষ)? আর, কীভাবে এ পরিবর্তন সাধিত হয়? পরবর্তীতে আরো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি-না, সেটি আরো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং একটি যথার্থ প্রশ্ন, যার উত্তর আমাকে দিতে হবে।

এখন আমি ইতিহাস থেকে তিনটি উদাহরণ দিতে চাই, যেখানে বিধানের পরিবর্তন হয়েছে, যা পরিণামে ইসলামের চূড়ান্ত রূপে উপনীত হয়েছে।

ইহুদি ধর্মে, ফিরাউনদের হাতে ইসরায়েলীদের অত্যাচারের সুদীর্ঘ ইতিহাসের দরুন তাদের মাঝে বীরত্ব ও প্রতিরোধের স্বাভাবিক মানবীয়-গুণাবলী লোপ পেয়েছিল - এমনকি, যখন তারা সত্যের পথে এসেছে, তখনো তারা সে-পথে বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারতো না। দীর্ঘ দিন যাবত নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার কারণে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ নেওয়া ছিল তাদের শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে। এটি কিছুটা সেই বিষয়ের অনুরূপ, যা কখনো কখনো ভারতবর্ষের কাশ্মীরীদের মাঝে ঘটে থাকে। যাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, তারা এক সময় বলতে শুরু করে, 'আচ্ছা, আমরা আমাদের শক্তিশালী-শত্রুদের ক্ষমা করলাম। কিন্তু, দুর্বল-শত্রুদের ক্ষমা করবো না।'

সুতরাং, যখন এমন বিকৃতিসমূহের উদ্ভব হয়, তখন যে-বিধান আসে, তা কেবল একটি সাময়িক বিধান (হয়ে থাকে) যার উদ্দেশ্য হল, যে-ক্ষতি হয়ে গেছে, তার সংশোধন করা। আর এটাই ঘটেছিল মূসায়ী প্রতিশোধের বিধানের ক্ষেত্রে: দাঁতের বদলে দাঁত; চোখের বদলে চোখ। আর, এর উপর এতখানি জোর দেওয়া হয়েছিল যে, মনে হয়, যেন ক্ষমা করার কোন অবকাশই নেই।

দীর্ঘদিন যাবত এ বিধান পালিত হতে থাকলো। এরপর আবির্ভূত হলেন ঈসা (আ.)। ততদিনে ইহুদিরা ক্ষমার নামটা পর্যন্ত ভুলে গেছে। তাদের অবস্থা কোথায় উপনীত হয়েছিল, তা জানার জন্য শেক্সপিয়ারের 'শাইলক' [মার্চেন্ট অভ ভেনিস] পড়াই যথেষ্ট। এখন, যদি ঈসা (আ.)ও তাদেরকে প্রতিশোধের অনুমতি না-ও দিতেন, তবুও সেই জাতি, যাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গিয়েছিল, তারা আর কোনো দিন ক্ষমা করতে পারতো না। তারা নিজ-ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য বলতো, 'প্রতিশোধেরও অনুমতি আছে, কেন প্রতিশোধ গ্রহণ করবো না?'

সুতরাং, ঈসা (আ.) তাদের নিকট হতে প্রতিশোধের অধিকার প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু, এ বিধানও স্থায়ী হতে পারে না।

এগুলো সেসব ক্ষেত্রের উদাহরণ, যেখানে কখনো কখনো বাহ্যিক (superficial) শিক্ষা অবতীর্ণ হয়, কিন্তু কেবল নির্ধারিত যুগ ও সময়ের জন্য, কোনো ঐতিহাসিক যুগের জন্য, স্থায়ীভাবে নয়।

এরপর আসে পবিত্র কুর'আন। এ বিষয়ে পবিত্র কুর'আনের শিক্ষা নিম্নরূপ:

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ

'ফা মান আফা ওয়া আসলাহা, ফা আজ্‌রুহু আলাল্লাহ' (আল-শূরা : ৪১)

প্রতিরোধের অধিকার তোমার আছে। বরং পুরো আয়াতটিতে বলা হয়েছে: 'যখন তোমার উপর অন্যায় করা হবে, তখন প্রতিশোধের অধিকার তোমার থাকবে; তবে তোমার উপর যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে, তার অতিরিক্ত নয়।'

এটি একটি নীতি। দ্বিতীয়ত, তুমি ক্ষমাও করতে পারো, তবে বিনা-শর্তে নয়। কেবলমাত্র তখনই ক্ষমা করতে পারবে, যখন ক্ষমার ফলে সংশোধন হবে। যদি ক্ষমার ফলে অপরাধী উৎসাহিত হয়, তবে ক্ষমা করার সুযোগ নেই।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِينَ ۝

অর্থ: এবং (স্মরণ রাখিও যে) মন্দের প্রতিফল উহার অনুরূপ মন্দ, এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে, তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র জিম্মায়। আল্লাহ্ যালেমদিগকে আদৌ ভালবাসেন না। (আল শূরা : ৪১)

এই হল কুর'আনের ভাষ্য, যা এ-দর্শনের উন্নয়নের শীর্ষে অবস্থান করছে। আবার কিছু বাহাই [যারা বিশ্বাস করে যে, কুর'আনের যুগ শেষ] বন্ধুদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আরো পণ্ডিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে; আমি অনেক ভ্রমণ করেছি, আর আমি সব সময় এ-প্রশ্ন তাদের সামনে উপস্থাপন করি: এ শিক্ষাকে যুগের নতুন-চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করার চেষ্টা করে দেখুন। কিন্তু এ পর্যন্ত আমি এমন একজন ব্যক্তিও পাই নি, যিনি এ' চূড়ান্ত-বিধানের মধ্যে কোনো পরিবর্তনের প্রস্তাব করতে সক্ষম হয়েছেন।

সুতরাং, ধর্ম যদি সুদৃঢ়, সহানুভূতিশীল-সহিষ্ণু (accommodating) হয়, আর যদি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, আর মানব-মননের গভীরে প্রোথিত হয়, তবে আমার মনে হয় না যে, এরূপ বিধানের মধ্যে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন রয়েছে। এ আলোচনাটি আজকের মূল আলোচ্য বিষয়ের বাইরের। অতএব, আমি আশা করি এটুকুই যথেষ্ট হবে এবং এখন অনুমতি হলে আমরা অন্যান্য মেহমানদের সুযোগ দিতে পারি তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা উপস্থাপন করার জন্য।

প্রশ্ন: 'শরীয়া ও দ্বীন' এর মধ্যে পার্থক্য কী? এই বিষয়ে একটু আলোচনা করবেন কি?

উত্তর: ধন্যবাদ। দেখুন, যে-কোনো দর্শন, যে-কোনো ইজম (ism), এমনকি যে-কোনো নীতি বা পথ, যাকে জীবন-দর্শন বা জীবন-বিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে - তার জন্য 'দ্বীন' শব্দটি প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কোনো কোনো মুসলমান আলেমের মতে মূর্তিপূজারীদের কোনো 'দ্বীন' ছিল না। এই আলেমদের কাছে এই ধারণাও অসহনীয় হবে যে, তাদের কোনো 'দ্বীন' ছিল। অথচ, পবিত্র কুর'আন তাদের উদ্দেশ্য করে বলে:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

লাকুম দীনুকুম ওয়া লিইয়া দীন (আল্ কাফেরূন :৭)

[অর্থ: তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।]

আবার যখন বলা হয়:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

(লা ইকরাহা ফিদ্দীন)

[অর্থ: ধর্মের বিষয়ে কোনো বল প্রয়োগ নেই।] (সূরা বাকারা : ২৫৭)

এখানে 'দ্বীন' শব্দটির আওতায় ঐ সকল মতবাদও অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে মানুষ জীবন-দর্শন হিসেবে গ্রহণ করে। এর অর্থ, কেবল খোদার উপর ঈমান নয়। এমনকি খোদাকে অস্বীকার করাও একটি দ্বীন হতে পারে।

অপরপক্ষে, 'খোদা'-র ধারণার উপর শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, যেখানে কোনো 'দ্বীন' এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে :–

(ক) একজন খোদা আছেন

(খ) মানুষ কীভাবে নিজ পরিণামের দিকে অগ্রসর হবে, সেই বিষয়ে যিনি তাঁর বিভিন্ন অভিলাষ প্রকাশ/অবতীর্ণ করেন এবং

(গ) যেখানে সেই আকাঙ্ক্ষা কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আইন বা নীতি হিসেবে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে [এই আইন বা নীতি বা বিধানের সমষ্টিকে] শরীয়ত বলে। শরীয়ত কেবল ইসলামের বিষয় নয়। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব শরীয়ত রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, যদি এটি রাষ্ট্রীয়-আইনের অংশ না-হয়, তাহলেও কি শরীয়ত পালন করা যায়? আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে, এটি মোটেও অসম্ভব নয়।

বাস্তবতা হল, বিশ্বের প্রায় সব-দেশেই সেখানকার বিভিন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলের লোকজন তাদের নিজেদের বিরোধসমূহ পারস্পরিক-সমঝোতার ভিত্তিতে সালিস-নিষ্পত্তি করতে পারে। আর আমি যতটুকু জানি, অধিকাংশ দেশের আইনে এই ধরনের আপোষ-রফার স্বীকৃতি এত দূর পর্যন্ত রয়েছে যে, যদি উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করে ঘোষণা দিয়ে বলে যে, এই মীমাংসা অপরিবর্তনীয়, তবে, এমনকি সর্বোচ্চ আদালতও [সুপ্রিম কোর্ট] সেই সিদ্ধান্ত রদ করে না।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ে আমাদের নিজস্ব কাযা বোর্ড ও কাযীগণ [বিচারকবৃন্দ] রয়েছেন। আর সকল আহমদী, যারা বিরোধ ও সমস্যাবলীর নিষ্পত্তির জন্য প্রচলিত-আইনের শরণাপন্ন হতে চান না, তারা কাযা বোর্ডে আসেন এবং একটি অঙ্গীকারনামায়/হলফনামায় স্বাক্ষর করে বলেন যে, আমরা স্বেচ্ছায়, কোনো বলপ্রয়োগ ছাড়াই আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি, যেন আপনারা কুর'আনের আইন-অনুসারে আমাদের বিরোধের মীমাংসা করেন।

আর এসব মামলায় কোনো সরকার কখনোই হস্তক্ষেপ করে নি, কোনো সরকার কখনোই এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে নি। এই প্রক্রিয়া অবাধে এগিয়ে চলেছে।

একইভাবে, ইবাদত বা উপাসনার সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা সর্বত্র বিদ্যমান। সকলেই নিজ-সন্তুষ্টি অনুযায়ী খোদার ইবাদত করার অধিকার রাখে, বা রাখা উচিত। কেবল পাকিস্তানের আহমদীরা ব্যতিক্রম - তবে সেটি একটি ভিন্ন বিষয়। তা না হলে আইনের পক্ষে একেবারেই এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না, যা ধর্মীয়-উপাসনায় বাধা সৃষ্টি করে।

সাধারণভাবে বলা যায়, জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনে পরিণত না করেও শরীয়ার অনুসরণ করা যায়।

প্রশ্ন: আপনি আপনার বক্তৃতায় বলেছেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পাকিস্তানে শরীয়াই হবে আইন; তবে, নতুন আইন-কানুন হবে না, কেবল পবিত্র কুর'আনের নীতির আলোকে আইনের প্রয়োগ হবে। কিন্তু, আপনি নিজে একে বাস্তবতাসম্পন্ন পান নি। আমি লক্ষ্য করছি যে, এ বিষয়টি নিয়ে আপনি অত্যন্ত গভীরভাবে পড়াশোনা করেছেন। সুতরাং, এই বিষয়ে আমি আপনার অভিমত জানতে চাই। একটি দেশে কীরূপ আইন প্রণয়ন করা উচিত? শরীয়াকে কি অস্বীকার বা রদ করা উচিত? একে কি পরিমার্জন করা উচিত? নাকি ধর্মনিরপেক্ষ আইন হওয়া উচিত? আর আপনার মতে এ-বিষয় থেকে উত্তরণের উপায় কী?

উত্তর: প্রশ্নটির জন্য ধন্যবাদ। আসলে আমার বক্তৃতার মাঝে এই বিষয়টি আলোচনা করা আমার নিজেরই উচিত ছিল। বস্তুত, ইসলামে সরকারের ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্যান্য বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে যা বুঝে নেওয়া দরকার।

আমি এ বিষয়টি নিয়ে গভীর মনযোগ সহকারে পড়াশোনা করেছি। আমি বিগত শতাব্দীর সে-সকল মুসলমান আলেমের লেখা পড়েছি, যারা এ বিষয়ে বিস্তর বক্তব্য রেখেছেন ও লিখেছেন; এবং তারা বিষয়টির সুষ্ঠু সুরাহা করতে পারেন নি। ইসলাম যদি এমন একটি সরকারের ধারণা প্রস্তাব করে, যা কি-না খোদার প্রতিনিধি, তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

অপরপক্ষে, ইসলাম যদি এমন এক সরকার-পদ্ধতির প্রস্তাব করে, যা বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য (common), তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন-চিত্র সামনে আসে।

আমার মতে প্রথমোক্ত বিষয়টি সঠিক নয়। কেননা, ইসলাম অন্য যে-কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদের চেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার-ব্যবস্থার তাগিদ দিয়ে থাকে।

এখন, কেউ এটি শুনে অবাক হবেন। কিন্তু, আমি পবিত্র কুর'আনের উদ্ধৃতিমূলে এ বিষয়টি প্রমাণ করতে পারি। ধর্মনিরপেক্ষতার একেবারে গোড়ার কথা এই যে, ধর্ম-বর্ণ-মতাদর্শ-গোত্রের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে যে-বিষয়টির প্রয়োগ হওয়া উচিত, তা হল পরিপূর্ণ ন্যায়-বিচার (absolute justice)।

বস্তুত এটিই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত সংজ্ঞা। আর এটিই সেই নীতি, যা রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে- কীভাবে কার্যাদি সম্পন্ন হবে, কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে- সেই সকল ক্ষেত্রে অবলম্বনের জন্য পবিত্র কুর'আন আমাদেরকে তাগিদ দেয়। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদ্‌লে
(আন-নাহ্‌ল: ৯১)

আল্লাহ আদেশ দেন সর্বদা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। এরপর বিষয়টিকে আরো জোরদার করা হয় এই বলে যে–

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

ওয়া লা ইয়াজরিমান্নাকুম শানা'নু কাওমিন
আলা আল্লা তা'দিলূ;
ই'দিলূ হুয়া আকরাবু লিত্তাকওয়া
(আল-মায়েদা: ৯)

তোমাদের এবং অন্য কারো মধ্যে যতই শত্রুতা থাকুক না কেন, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ ন্যায়-বিচার করা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অনুমতি দেয় না। সর্বদা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। উহা খোদাভীরুতার নিকটতর।

সরকার হিসেবে যখন আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করবেন, তখন সেই দায়িত্বসমূহ পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারের দাবিকে মাথায় রেখে আদায় করবেন। এখন, যখন সরকারের কেন্দ্রীয়-নীতি হিসেবে পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পেল, তখন একজন অমুসলিমের উপর ইসলামী আইন কীভাবে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে? কেননা, এটি ন্যায়বিচারের দাবির পরিপন্থী হবে। আর এতে বহু স্ববিরোধীতার উদ্ভব হবে।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾

অর্থ: আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বারণ করিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (সূরা আন-নাহল: ৯১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

অর্থ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (আল মায়েদা : ৯)

সুতরাং, যদি আপনারা এ কেন্দ্রীয় বিষয়টির উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন, আপনারা এটি আবিস্কার করে বিস্মিত হবেন যে, আমি এ বিষয়ে যে-ব্যাখ্যা প্রদান করছি বা যাকে আমি সঠিক ব্যাখ্যা মনে করছি, এটি সেই ব্যাখ্যাই, যা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুশীলন থেকে সাব্যস্ত হয়।

হিজরতের পর যখন তিনি মদীনায় অবস্থান করেন, তখন তিনি এমন ইহুদি ও অন্যান্য কতিপয় সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে আসেন যারা তাঁকে ধর্মীয়-নেতা হিসেবে মেনে না নিলেও রাজনৈতিক-নেতা হিসেবে মেনে নেন। তারা সম্মত হন যে, সকল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাঁর [মুহাম্মদ (সা.)] কাছে উপস্থাপন করা হবে এবং বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান সকল বিবাদ মীমাংসার জন্য তারা তাঁর বিচারের উপর আস্থা রাখবেন। আর এটিই 'মদীনা-সনদ' নামে পরিচিত।

সে-সময় ইসলামী-আইন অবতীর্ণ হয়ে গেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে ইহুদিরা এসেছে নির্দেশনা বা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য। বিনা-ব্যতিক্রমে, সর্বদাই তিনি তাদের প্রশ্ন করেছেন: 'আপনারা কি চান, আপনাদের বিরোধ ইহুদি-আইনে নিষ্পত্তি করা হোক, নাকি ইসলামী-আইনে অথবা পারস্পরিক সালিস বা আপোষ-রফার মাধ্যমে?'

বিনা ব্যতিক্রমে, কখনোই তিনি অসম্মত কোনো পক্ষের উপর, যারা ইসলামের অনুসারী নন, ইসলামী আইন চাপিয়ে দেন নি।

একেই আমি বলি পরিপূর্ণ-ন্যায় বিচার। সুতরাং, পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারের প্রয়োগ কোনো সত্যিকার ইসলামী- সরকারকে করতে হবে, যদি তারা নিজেকে 'ইসলামী সরকার' বলে দাবি করার স্বপ্ন দেখে। আর, এটাই অন্য ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

প্রশ্ন: যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন ভিন্ন ভিন্ন আইনের, হিন্দুদের জন্য আইন, খ্রিষ্টানদের জন্য আইন, ইত্যাদি, তাহ'লে আমার মনে হয় সমাজের জন্য তা অস্থিরতার কারণ হবে।

উত্তর: একদম ঠিক কথা, আমিও এটাই বলছি। আমি মোটেই প্রস্তাব করছি না যে, প্রতিটি রাজনৈতিক সরকারের হাতে এক গুচ্ছ আইন থাকবে যার একেকটি একেক ধর্মের জন্য প্রযোজ্য হবে। এটি সম্ভব নয়। এটি বাস্তবসম্মতও নয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতির উপসংহারী বক্তব্য :-

এখানে আমরা খ্রিষ্টান, হিন্দু, মুসলিম, বিভিন্ন ধর্মীয়-সম্প্রদায় একসঙ্গে কাজ করছি। এটি মনে হচ্ছে যে, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে, কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না-করেই আমরা খুব ভাল একটি ভিত্তির উপর কাজ করছি। সবগুলো সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আপনি যখন আমাদের দেশ সুরিনাম ছেড়ে চলে যাবেন, এখানে সৎচিন্তা, সৎ-অনুভূতি এবং অবশ্যই আপনার অনেক সুহৃদকে ছেড়ে যাবেন।

আপনার যাত্রা নিরাপদ হোক।

নতুন বই পরিচিতি

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আরবী ভাষায় রচিত **'হামামাতুল বুশরা'** বইটি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির অনুবাদ করেছেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব।

এ বইটিতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) একাধারে **দাজ্জাল, ইয়া'জুজ-মা'জুজ, দাব্বাতুল আরয-এর আবির্ভাব, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ, নুযুলে ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা, তাঁর মুহাদ্দাস হওয়া, ফিরিশ্‌তাদের প্রকৃত পরিচয়** ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন। বইটি জ্ঞানপিপাসুদের জন্য জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার।

বইটির মূল্য ১০০ টাকা।

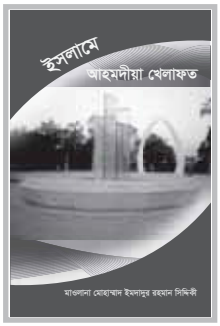

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী (প্রিন্সিপাল, জামোয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ) সাহেব রচিত **'ইসলামে আহমদীয়া খেলাফত'** বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

এ বইটিতে **খেলাতের নেযাম সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।**

বইটির মূল্য ১০০ টাকা।

আমহদীয়া লাইব্রেরী-তে পাওয়া যাচ্ছে।
আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।